



এক Wilkinson বিদায়ের নীরবতা

কী অদ্ভুত নিয়তি আমার।
বরাবর একা।
এত নারীর মাঝখানে বসে।
কখনও কেন্দ্রে নয়।
শুধুই অতিথি।
সত্যি বলতে, ওই ভূমিকাটা আমার কখনও অস্বস্তিকর লাগেনি।
আমার মন বরাবর কেড়েছে অন্য একটা জিনিস।
এমন কিছু, যা নারীরা না চেয়েই নিয়ে নেয়।
টাকা নয়।
ওটা বরাবরই সবচেয়ে কম আকর্ষণীয় অংশ।
তারা নেয় মনোযোগ।
কৌতূহল।
ভাবনা।
সময়ের টুকরো।
তোমার মানসিক শক্তির গোটা গোটা ভাগ।
আর বেশির ভাগ সময় তারা তা করে নিজেরা টেরও না পেয়ে।
প্রথম নিয়মটা বরাবর একই থেকেছে।
ওদের মুখে হাসি ফোটাও।
কিন্তু ভাঁড়ামি না করে।
কারণ রসবোধ আর নিবুদ্ধিতার মধ্যে বিস্তর ফারাক।
প্রথমটা কথোপকথনের দরজা খোলে।

দ্বিতীয়টা বন্ধ করে।

নইলে সবচেয়ে অভিজাত নৈশভোজও শেষমেশ ফাস্ট ফুডের খাওয়ার চেয়ে বিশেষ কিছু থাকে না।

ঠিক তখনই আমি ইম্পাত নিয়ে আমার ব্যক্তিগত নৃতাত্ত্বিক তত্ত্বটা ব্যাখ্যা করতে শুরু করলাম।

আশা ছিল, কথাটা বিশ্বাসযোগ্য শোনাবে।

লোকে বিশ্বাস করবেই, এমন নয়।

কল্পনা করলাম সুদূর এক সকাল।

এক পুরুষ গুহা ছেড়ে বেরিয়েছে এক প্রেমের অভিসারে।

কিন্তু তার সঙ্গিনীর তাকে যেতে দেওয়ার কোনো ইচ্ছে ছিল না।

বনের ভেতর দিয়ে সে তার পিছু নিল।

জানতে চাইছিল, লোকটা কোথায় যাচ্ছে।

কার সঙ্গে।

আর কেন।

সেকালে সবাই ছিল স্বাধীন, আর সমাজতাত্ত্বিকেরা তখনও অবাধ যৌনাচার আবিষ্কার করে উঠতে পারেননি।

একসময় পুরুষটি রাগে ফেটে পড়ল।

একটা পাথর কুড়িয়ে নারীটিকে তাড়াতে তার দিকে ছুড়ে মারল।

পাথরটা গিয়ে লাগল একটা শিলায়।

একটা ফুলকি।

তারপর আরেকটা।

তারপর ধোঁয়া।

বাকিটা করল হাওয়া।

আর আগুনের জন্ম হল।

প্রেমের অভিসার তক্ষুনি শেষ।

যা ঘটেছে, তা ঢের বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

তখনও কোনো ম্যানুয়ালে তার বর্ণনা নেই।

এমনকি Amazon-এর ম্যানুয়ালেও নয়।

ওটাকে লক্ষ করা দরকার।

বোঝা দরকার।

কাজে লাগানো দরকার।

টেবিলের নারীরা চুপ করে শুনছিলেন।

কেউ খাচ্ছিলেন না।

ওয়েটারকে সুপগুলো রান্নাঘরে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে দ্বিতীয়বার গরম করতে হল।

তারপর ঘটল আরও আশ্চর্য একটা ব্যাপার।

আশপাশের টেবিলে বসা কয়েকটি যুগল তাদের চেয়ার আমাদের কাছে সরিয়ে আনল।

মনে হচ্ছিল থিয়েটারের অভিনয়।

অথচ আমি শুধু ওঁদের মুখে হাসি ফোটাতে চেয়েছিলাম।

ওই মুহূর্তেই আমি আর বিশ্বাসযোগ্য রইলাম না।

লোকে আমাকে বিশ্বাস করতে শুরু করল।

আমি এমন এক গল্প বলছিলাম, যা কেউ কখনও লেখেনি।

আমাদের পূর্বপুরুষদের এক সম্ভাব্য গল্প।

আমি থামলাম।

ম্যাগির দিকে তাকলাম।

“আপনি কি চান আমি চালিয়ে যাই?”

তিনি এক সেকেন্ডও দ্বিধা করলেন না।

“হ্যাঁ, দুর্দান্ত হারামজাদা কোথাকার।”

আর আমরা সবাই হাসিতে ফেটে পড়লাম।

তারপর আমি বলে চললাম।

আগুন পেয়ে নারী বুঝতে শুরু করল, এই আবিষ্কারকে খাবারের কাজে লাগানো যায়।

তাপ স্বাদ বদলে দিল।

খোদ প্রকৃতিকেই রূপান্তরিত করল।

মানুষের যে গড় আয়ু কোনোমতে কুড়ি বছরে পৌঁছত, কারও অজান্তেই তা ধীরে ধীরে চল্লিশের দিকে এগোল।

আগুন তাকে দ্বিগুণ করে দিয়েছিল।

জীবাণুর দূষণ কমল।

সংক্রমণ পিছু হটল।

মানুষের শরীর সময় পেল।

তারপর, নিতান্ত সাধারণ এক বিকেলে, একটা গুহার সামনে, সেই নারীই কয়েকটা পাথর কুড়িয়ে নিল।

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল।

একটার সঙ্গে আরেকটা ঠুকল।

নিরীক্ষণ করল।

ব্লাস্ট ফার্নেস ছাড়াই।

ইস্পাত কারখানা ছাড়াই।

ইঞ্জিনিয়ার ছাড়াই।

সে শুরু করল সেই দীর্ঘ যাত্রা, যা একদিন পৌঁছে দেবে ধাতুতে।

আর পরে, ইস্পাতে।

সেই কারণেই, একজন নারী না থাকলে আমি আজ এখানে থাকতাম না।

আপনাদের সঙ্গে আমার কখনও দেখা হত না।

আপনাদের কদর কখনও বুঝতাম না।

আমি যা হয়ে উঠেছি, তা কখনও একটা বিদায়ের মোড়কে মুড়ে দিতে পারতাম না।

টেবিল নীরব হয়ে রইল।

অন্য সব নীরবতার চেয়ে আলাদা এক নীরবতা।

এ প্রতিষ্কার নীরবতা নয়।

এ বিদায়ের নীরবতা।

ম্যাগির দিকে তাকলাম।

তঁার মেয়ের দিকে তাকালাম।

তঁার নাতনিদের দিকে তাকালাম।

আর বুঝলাম, আমি কোনো পরিবারকে বিদায় জানাচ্ছি না।

বিদায় জানাচ্ছি একটা গল্পকে।

Wilkinson পরিবার

স্বাগতম।

আমি উঠে দাঁড়িলাম, তারপর চলে গেলাম।

কারণ নারীর চোখের জল আমি কোনোদিন সইতে পারিনি।

ফের্দিনান্দো